মডিউল-২৯

কোর্সকোড- BENG-H-CC-T-14

কোর্স নাম - সংস্কৃত, ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস ও লোকসাহিত্য

মিলন মণ্ডল

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

এস. আর. ফতেপুরিয়া কলেজ, বেলডাঙ্গা।

পর্ব-১ বিষয়: কালিদাসের নাটক।

বিন্যাসক্রম

২৯.১ উদ্দেশ্য

২৯.২ প্রস্তাবনা

২৯.৩ কালিদাসের সময়কাল

২৯.৪ কালিদাসের নাটকগুলির উৎস ও পরিচয়

২৯.৫ নাটকগুলির কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ক) মালবিকাগ্নিমিত্র

খ) বিক্রমোবশীয়

গ) অভিজ্ঞানশকুন্তলম

২৯.৬ আদর্শ প্রশ্নাবলী

২৯.৭ সহায়ক গ্রন্থাবলী

২৯.৮ উত্তর সংকেত

২৯.১ উদ্দেশ্য

- ‘প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা ও সাহিত্য’ বলতে ব্যাপকতর অর্থে ‘সংস্কৃত’ ভাষা ও সাহিত্যকে বুঝোয় তা জানবে।
- ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্য সম্পর্কে জানবে।
- সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের পূর্ব ও পরবর্তী সময়কালের কবি সাহিত্যিকদের সম্পর্কে জানতে পারবে।
- কালিদাসের নাটকগুলির সঙ্গে পরিচিতি লাভ করবে।

২৯.২ প্রস্তাবনা

ব্যাস, বাল্মিকীর পরে ভারতবর্ষে যে কবির নাম পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়, তিনি হলেন কালিদাস। আমাদের চেতনা ও ঐতিহ্যের বাহক রূপে বহু যুগ ধরে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন। অন্য ভাবে বলা যায় বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, ইংরেজি সাহিত্যে শেকস্‌পীয়রের মতো সংস্কৃত সাহিত্যে বিরাজ করছেন কালিদাস। প্রেম-সৌন্দর্য ও কল্যাণদীপ্ত এক সুমঙ্গল মতাদর্শের স্রষ্টা ও উপভোক্তা ছিলেন কালিদাস। কোনো কোনো সমালোচক কালীদাসের যুগন্ধর কবি রূপে সম্মান করলেও সাহিত্যে তাঁর যুগাতিশায়িতার দিকটি এড়িয়ে গেছেন। কালিদাসকে মতো মহৎ ও বিরল প্রতিভাকে কোনো সংকীর্ণ সীমায় আটকে রাখা যায় না। তিনি নিজেই একটি যুগের সূচনা করেছেন। তাঁর রচিত কাব্য ও নাটক সংস্কৃত সাহিত্যকে বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই আলোচনায় আমরা কালিদাসের নাটকগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করবো এবং সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে কালিদাসের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করব।

২৯.৩ কালিদাসের সময়কাল

কালিদাসের সময়কাল নিয়ে নানা আলোচনা ও মতামত প্রচলিত আছে। কেউ বলে কালিদাস খ্রীষ্টপূর্ব ৫৭ শতকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কালিদাসের কাব্যে ভাসের নাম উল্লেখ করেছেন। আবার তাঁর কাব্যে অশ্বঘোষের রচনার প্রভাব রয়েছে। কাজেই কালিদাস ভাস ও অশ্বঘোষের পরবর্তীকালের কবি। অতএব কালিদাসের কালকে কোনোমতেই দ্বিতীয় শতকের পর্বে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কালিদাসের আবির্ভাব কাল নিয়ে তৃতীয় মতটি ফার্গুসনের। তাঁর মতে, কালিদাসের আবির্ভাব কাল খ্রীষ্টীয় ষষ্ট শতাব্দী। তিনি মনে করেন, মালব রাজা যশোবর্মণের সমসাময়িক হলেন কালিদাস। কারণ– (ক) ষষ্ঠ শতকে বরাহমিহির কালিদাসের সঙ্গে নবরত্ন সভায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ফার্গুসনের মতকে খণ্ডন করেন ফ্লীট ও ম্যাকডোনেল। কালিদাস সম্পর্কিত সমস্ত বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে এ বী কীথ সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তাইই সকলে গ্রহণ করেচেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের চরম সমৃদ্ধির যুগে কালিদাসের আবির্ভাব সম্ভব। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৮০-৪১৩ খ্রী) ‘বিক্রমাদিত্য’ উপাধি ধারণ করেন এবং রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে উজ্জয়িনীতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেন। বিক্রমাদিত্যেরই রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলে ঐতিহ্যের সঙ্গে ইতিহাসেরও একাত্মতা জন্মে। কালিদাস কুমারাদিত্যের পর তাঁর পুত্র স্কন্ধগুপ্তের (৪৫৫-৪৬৭ খ্রী:) রাজত্বকালেও বর্তমান ছিলেন। কিন্তু তারপরে কখনোই নয়। এ বিষয়ে এ. বী কীথের অভিমতটি হল– ‘‘Kalidas then lived before A. D. 472 and probably at a considerable distance, so that to place him about A.D. 400’’ এই মতকেই আমরা গ্রহণ করতে পারি। তাইতো রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বলেছিলেন–

‘‘হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল পণ্ডিতরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল।’’

তাই সকল বিচার বিতর্কের ঊর্ধ্বে কেবল কবিকে নিয়ে নয়, বরং তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের রসেই আকণ্ঠ

তৃপ্ত থাকার বাসনা প্রকাশ করতে হবে।

২৯.৪ কালিদাসের নাটকগুলির উৎস ও পরিচয়

কালিদাস রচিত নাটকের সংখ্যা তিনটি। যথা—'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'বিক্রমোর্বশীয়' এবং 'আভিজ্ঞানশতুন্তলম'। 'মালাবিকাগ্নিমিত্র' নাটকটির কাহিনী কাল্পনিক। তবে ঐতিহাসিক চরিত্রের সঙ্গে এই নাটকের কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। আসলে এই নাটকে ইতিহাসের একটা আবরণ দেওয়া হয়েছে। এই নাটকের কাহিনী মূলত অগ্নিমিত্র ও মালবিকার প্রণয় কাহিনী নির্ভর। তবে নাটকে হরবতীর ঈর্ষা ও প্রৌঢ়া মহিষী ধরিত্রীর ঔদার্য নাটকের কাহিনীকে সংঘাতময় করে তুলেছে। এই নাটকে উল্লেখযোগ্য দিক বিদূষক গৌতমের সরস সংলাপন। যার ফলে নাটকটি পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় নাটক হল 'বিক্রমোধশীয়'। এই নাটকটি পঞ্চমাস্ক বিশিষ্ট। 'বিক্রমার্বশীয়' নাটকটি শৃঙ্গার রস প্রধান নাটক। রাজা পুরুষবা ও স্বর্গভ্রষ্টা ঊর্বশীর প্রণয় কাহিনী অবলম্বনে নাটকটি রচিত হয়েছে। কালিদাস নাটকের কাহিনী বেদ ও পুরাণ থেকে গ্রহ করেছেন। তবে নাটকটিতে রূপকথার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। অনেকে এই নাটকটিকে সংস্কৃত গীতিনাট্যের একমাত্র নিদর্শন মনে করেন। নাটকটিতে অপভ্রংশ ভাষায় লেখা অনেকগুলি গান রয়েছে। সেই দিক থেকে দেখলে বলা যেতে পারে নাটকটির মধ্যে তৎকালীন কথ্যভাষার প্রয়োগ হয়েছে। তাই নাটকটি পুরাতন খাঁটি নিদর্শন রূপেও গৃহীত হতে পারে।

কালিদাসের তৃতীয় নাটক হল 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম'। মহাকবি কালিদাসের এটি শ্রেষ্ঠ নাটক। এই নাটকটি সপ্তম অঙ্ক বিশিষ্ট। পুরু বংশীয় রাজা দুষ্মন্তের সঙ্গে মহর্ষী কণ্বের আশ্রমে বালিকা শকুন্তলার গান্ধর্ব বিয়ে হয়। ঋষি দুর্বাশার শাপে তাদের মধ্যে সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটে। শেষ পর্যন্ত মহর্ষী মারীচের আশ্রমে স্বপুত্র শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তের মিলনে নাটকটির পরিসমাপ্তি ঘটে। এই নাটকেই কালিদাসের প্রতিভার মৌলিকতার সঙ্গে উৎকৃষ্ট শিল্পরীতির মিশ্রণ ঘটে। প্রেমের পরিপূর্ণ মূল্য দান করেও কালিদাস তাঁর কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ মহাকাব্যে এবং মেঘদূত কাব্যে ও মালবিকাগ্নিমিত্র ও অভিজ্ঞান শকুন্তলম নাটকে দাম্পত্য জীবনের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তেমনি সৌন্দর্য সম্ভোগের পরিণতি মঙ্গলের ইঙ্গিত দিতে পারে না তাকেই তিনি অভিশপ্ত বা ব্যর্থ বলে দেখিয়েছেন।

২৯.৫ নাটকগুলির কাহিনীর সংক্ষিপ্তত পরিচয়

ক) মালবিকাগ্নিমিত্র
খ) বিক্রমোর্বশীয়
গ) অভিজ্ঞান শকুন্তলম

ক) মালবিকাগ্নিমিত্র:

পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট কালিদাসের প্রথম নাটক 'মালবিকাগ্নিমিত্র'। নাটকের প্রস্তাবনায় একে কাব্যম

নয়ন অর্থাৎ নতুনতর রচনা বলা হয়েছে।

নাট্যকথা

বিদিশারাজ অগ্নিমিত্রের অন্তঃপুরের ষড়যন্ত্রের কাহিনীকে অবলম্বন করে এ নাটক রচিত। বিদর্ভের রাজা মাধব সেন যজ্ঞসেনের সঙ্গে যুদ্ধে পরাভূত হন। মাধবসেন রাজচ্যুত হয়ে আপন ভগ্নি মালবিকাকে বিদিশার রাজা অগ্নিমিত্রের হাতে সমর্পণের জন্য প্রেরণ করেন। পথে দস্যুরা তাঁকে লুট করে কিন্তু অগ্নিমিত্রের সেনাপতি বীরসেন দস্যুদের হাত থেকে মালবিকাকে রক্ষা করে তুলে দেন বিদিশার রাজমহিষী ধরিত্রী দেবীর হাতে। তিনি রাজার রূপ মোহের কথা জানতেন, তাই রাণী সব সময় মালবিকাকে অগ্নিমিত্রের চোখের আড়ালে রাখবার চেষ্টা করেন। মালবিকার অসাধারণ সৌন্দর্যকে তিনি ভয় করেন। রাজা প্রথমে মালাবিকার প্রতিকৃতি দেখে মুগ্ধ হন ক্রমে মালবিকার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ সৃস্টিহয়। এক সময় উদ্যানে মালবিকাকে দেখতে পেয়ে রাজা তাকে আলিঙ্গন করেন। কনিষ্ঠা মহিবী ইরাবতী দূর থেকে তা দেখতে পেয়ে অত্যন্ত রুষ্টা হলেন, এবং রাজা অপমানিত করলেন। জ্যেষ্ঠা মহিষী ধারিণী অনর্থ নিবারণের জন্য মালবিকাকে রুদ্ধ করলেন। বিদষকের কৌশলে রাজার সঙ্গে মালবিকার পুনর্মিলনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু ইরাবতীর জন্য এবারও এ মিলন ব্যর্থ হল। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, মালবিকা রাজকন্যা, দস্যু হস্তে পড়ে ঘটনা। চক্রে বিদিশা রাজের অন্তঃপুরের স্থান পেলেন সেবিকা রূপে।

মিলনের সকল বাধা দূর হল রাজা অগ্নিমিত্র ও মালবিকার মিলন ঘটল। অন্যদিকে বীরসেনের হাতে যজ্ঞসেনের পরাজয় ঘটে। মাধব সেন মুক্তি পান। তাকে বিদর্ভ রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। নাটকের পঞ্চমাঙ্কে এক পরিব্রাজিকার মালবিকার প্রকৃত পরিচয় ব্যক্ত করেছেন। তখন মহারাণী ধরিত্রী উদার হয়ে মহারাজের সঙ্গে মালাবিকার বিবাহ দিয়ে দেন।

নাট্যস্বরূপ

কালিদাসের প্রথম নাটক মালবিকাগ্নিমিত্র অপরিণত রচনা। অনেকে মনে করেন মহাকবি ইচ্ছা করেই তৎকালীন রাজ অন্তঃপুরের জীবনকে ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্যে এ নাটক রচনা করেছেন। তবে, নাটকটির বিশেষ দিক এই যে, বিদুষকের চরিত্র এ নাটকে জীবন্ত হয়ে উঠেছে এবং নাটকের ইঙ্গিত পরিণতি সম্পাদনে বিদূষক এ নাটকে যতখানি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, সেরূপ মহকবির অন্য কোনো দৃশ্যকাব্যে দেখা যায় না।

নাটকটিকে সেকালের নাটকের প্রতিনিধি মহানীয় বলেই গ্রহণ করা যায়, রাজকীয় প্রেমই এ নাটকের বিষয়। নানারূপ বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে শেষে নায়ক-নায়িকার মিলন হয়। গতানুগতিকতায় নাটক সমাপ্ত। রস বিচারে এটি সাধারণ মাপের কমেডি বলা যেতে পারে। নায়কের মধ্যে নায়কোচিত গুণও মূর্ত হয়নি। নায়ক সুন্দরী নায়িকা হয়ে নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অবশ্য এ নাটকে নাট্যকার তৎকালীন রাজ-অন্তপুরের প্রতি কিছু তির্যক দৃষ্টিপাতও করেছেন যা সেকালের অন্য নাট্যকারের মধ্যে লক্ষিত হয় না।

চরিত্র-চিত্রণ

''মালাবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের চরিত্র-চিত্রণে কালিদাস বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এ নাটকের উজ্জ্বলতম চরিত্র বিদূষক বেশ প্রাণবন্ত। তার উপস্থিতি ভিন্ন এ নাটকে পরিণতি স্পর্শ করতে পারে না।

রাজার প্রথমা মহিষী ধরিত্রীর মানস ক্রিয়ার টানাপোড়েন বেশ দক্ষতার সঙ্গে নাট্যকার অন্তন করেছেন। প্রথমা মহিষী ব্যক্তিত্ব সম্পন্না, দৃঢ়চেতা সম্পন্না এবং পদমর্যাদায় নিষ্ঠ। চরিত্রগত দিক থেকে অন্তর্মুখী হলেও তিনি সহিষ্ণু ধীর শান্ত ও উদার।

দ্বিতীয়া মহিবী ইরাবতীর মধ্যে ধরিত্রীর মত সংযম নেই, সে ঈর্ষাকাতরা হি অধৈর্য। রাজাকে কথায় কথায় তিনি তিরস্কারও করেছেন। রাজ মহিযীর পদমর্যাদা সম্পর্কে তিনি সেরূপ সচেতন নয়। মালবিকা শান্ত। তার হৃদয় স্নেহে, প্রেমে পরিপূর্ণ। কিন্তু অনু তাঁর সঙ্গী কৌশিকী বহু গুণান্বিতা। তাঁর উদারতা প্রশংসনীয়। সে মুর্তিমতী শান্তি স্বরূপা। নায়ক অগ্নিমিত্রের মধ্যে প্রেমের উন্মত্ততা, যৌবনোন্মত্ততা বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। অপরা স্নেহময় কঠোরকোমলের সমন্বয়ে চরিত্র জীবন্ত।

মূল্যায়ন

নাটকটিকে শুধুমাত্র একটা প্রেমের কাহিনী বলে মনে করলেন ভুল হবে। এই নাটকে তৎকালীন রাজঅন্তঃপুরের বিলাসময় জীবনের প্রতি ব্যঙ্গ আছে, আছে মানব চরিত্রের সংকীর্ণতা ও মহত্বের পরিচয়। সেই সঙ্গে ধনী ব্যাক্তিদের চরিত্র-চিত্রণেও কবি-নাট্যকার কালিদাদ দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন।

রাজপ্রাসাদের সানুপুঙ্খ ছবি ও রাজ অন্তঃপুরের বিলাস বৈভব ও ভোগাসক্তির চিত্রাঙ্গনে মহাকবি মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন। মালবিকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা, প্রেমিক-প্রেমিকার বিলাসকল আবেগ চঞ্চলতা এ সবই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নাটকের সব চরিত্র চিত্রণ সমান দক্ষতার মাত্রা না পেলেও কোনো কোনো চরিত্রের নাট্যকার কবি কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। অগ্নিমিত্র, বসুমিত্র, বিদর্ভরাজ যজ্ঞসেন, পুষ্যমিত্র, জ্ঞাতিভ্রাতা মাধবসেন প্রমুখ চরিত্রের একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। নায়ক চরিত্ররূপ অগ্নিমিত্র বেশ দুর্বল। অগ্নিমিত্র শুধুমাত্র প্রেমিক রূপে চিত্রিত হননি, তাঁর রাজোচিত মহিমার পরিচয়ও এ নাটকে বর্ণিত

পার্শ্বচরিত্র রূপে বিদূষক অসাধারণ। তাঁর কৌতুকপ্রিয়তা, ভোজন রসিকতা, ব্যঙ্গ-বঙ্গ এ সবই বেশ উচ্চতারে বাঁধা হাস্যরসাত্মক।

স্ত্রী চরিত্রণেও কালিদাস দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ধরিণীকে নাট্যকার ধীরতা, স্থিরতা সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তিরূপে গড়ে তুলেছেন। ছোটরাণী ইরাবতী ধরিণীর বিপরীত ধর্মী। তাঁর চরিত্রে সহিষ্ণুগুণ নেই বললেই চলে। রাজার প্রতি অকথ্য ভাষা ব্যবহারেও তিনি কুণ্ঠিতা নন। তাঁর প্রতি নায়িকা কেন্দ্রীক মনোভাব পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না।

মালবিকা সহাদয়া ধৈর্যশীলা, মালবিকার সহচরী কৌশিকী উদার প্রকৃতির। এই নারী নৃত্যকুশলী সর্প বিষের ঔষধ বিষয়েও পারদর্শী। সর্বোপরি প্রৌঢ় রাজার প্রণয়কে কেন্দ্র করে তাঁর সঙ্গে দুই রাজমহিষীর সংঘাত পূর্ণ ঘটনার মাধ্যমে গোপন প্রেমের সফল পরিণতি এ নাটকে ভিন্ন মাত্রা দান

করেছে। সুতরাং সবদিক বিচার বিশ্লেষণ করে এই নাটকটিকে আমরা কালিদাসের অপরিণত রচনা বলতে পারি না। বরং দোষ-ত্রুটি, দুর্বল নাট্য সংলাপ সত্ত্বেও মহাকবির নাট্যকার হয়ে ওঠার প্রয়াসচিহ্ন এ নাটকে সুস্পষ্ট।

এ নাটকে সে কালের নাটকাভিনয় ব্যবহার বিশেষ মূল্যবান তথ্য আমরা পাই। সমকালের সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিফলনও এ নাটককে আছে। ফলকথা ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকটি সম্পূর্ণতা পেয়েছে।

বিক্রমোর্বশীয়

সংস্কৃত আলংকারিকদের বিচারে মহাকবি কালিদাসের দ্বিতীয় নাটক 'বিক্রমোর্বশীয়'। অধ্যাপক ড. সুকুমার সেন তাঁর 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে 'বিক্রমোর্বশীয়ম' নামে নাটকাটিকে উল্লেখ করেছেন। এটি পাঁচ অঙ্কে দৃশ্যকাব্য 'ত্রোটক'। সংস্কৃতে সঙ্গীতবহুল মিলনান্তক নাটককেই 'ত্রোটক' বলে। রাজা পুরুরবা ও উর্বশীর প্রেম কাহিনী জন-মন-মানসে চলে আসছে সেই ঋকবেদের আমল থেকে। ঋকবেদের ব্রাহ্মণে নানা পুরাণ-বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, ভাগবৎপুরাণ, মহাভারত, কথাসরিৎসাগর ইত্যাদি গ্রন্থে পুরুরবা ও উর্বশীর প্রণয় কাহিনীর উল্লেখ আছে। কিন্তু তা হলেও কালিদাস স্বীয় কল্পনার দ্বারা এ প্রেম কাহিনীকে একটি নির্দিস্টমাত্রা দান করেছে। সম্ভবত এটি ইন্দো-ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম রোমন্টিক প্রেম কাহিনী। মূলত একটি বিয়োগান্তক কাহিনীকে কালিদাস মিলোনান্তক কাহিনীতে পরিণত করেছেন। নানাবিধ কাল্পনিক ঘটনার সমাবেশ কোথাও কোথাও রূপকথার গল্পও এতে স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য বৈদিক অথবা পৌরাণিক উপাখ্যান কালিদাসের নাট্যকাহিনীর মূল উৎস হলেও অভিজ্ঞান শকুন্তলার মত এর কাহিনী পরিকল্পনাতে অভিনবত্বের ছাপ আছে। মৎসপুরাণে উল্লেখিত আছে ভরতের দ্বারা অভিশপ্তা হয়ে উর্বশী লতায় পরিণত হয়। কালিদাস তাঁর নাটকে এ কাহিনীকে গ্রহণ করলেও উর্বশীর মর্ত্যবাস, অন্তঃপুরের দ্বন্দ্ব এবং অভিশপ্তা নায়িকার সন্ধানে রাজার বিলাপময় সংলাপ, এ সবই কালিদাসের স্বকল্পিত বিষয়।

নাট্যকথা

একদিন শির্বাচনার জন্য উবশী কৈলাসে গিয়েছিলেন। শিব পূজা ছেড়ে উর্বশী যখন কৈলাস থেকে স্বর্গে ফিরছিলেন তখন দৈত্যদের হাতে নিপীড়িত হবার সময় আত্মরক্ষার জন্য তিনি চীৎকার করেন। সূর্যপূজা সমাপন করে প্রত্যাবর্তনের পথে উবশীর আর্তরব গুনে পুরুরবা দৈত্যদের হাত থেকে উর্বশীকে রক্ষা করেন এবং তাঁর প্রতি আসক্ত হল। পুরুরবার এই মহত্বে গন্ধরাজ চিত্ররথ তাঁকে সংবর্ধনা করেন। বিদায় নেবার সময় নানা ছলে উর্বশী পুরুরবার প্রতি প্রেমঘন আকুল দৃস্টিতে চেয়ে থাকেন। রসিকরাজা এর মর্মার্থ বুঝে নিজে প্রেমাকৃষ্ট হন। এরপর যথারীতি পত্রলাপ এবং সাক্ষাৎকারে সে প্রেম আরও ঘনীভূত হয়। গোপন প্রেমের খবর জানাজানি হয়ে লজ্জিত পুরুরবা রাণীর কাছে মার্জনা প্রার্থনা করেন। রাণী তাকে মার্জনাও করেন। ইতিমধ্যে ইন্দ্রের আহ্বানে নাট্যাভিনয়ের উর্বশীকে স্বর্গে যেতে হয়। স্বর্গে 'লক্ষ্মী স্বয়ংবর' নাটকের অভিনয়ে উর্বশীকে লক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়। রাজা পুরুরবার চিন্তায় অন্যমনা উর্বশী অভিনয়কালে পুরুষোত্তমের বলতে গিয়ে বলে ফেলেন পুরুরবা। তাঁকে এই

কৃতকর্মের জন্য নাট্যক্তরু ভরতমুনি তাঁকে অভিশাপ দিলেন যে, তাঁর স্বর্গে স্থান হবে না; তাঁকে মর্ত্যে নেমে আসতে হবে। অবশ্য ইন্দ্রের কৃপায় তাঁর অভিশাপ লাঘর হল। ইন্দ্র তাঁকে মর্ত্যে পুরুরবার সঙ্গে বসবাসে অনুমতি দেন, কিন্তু শর্ত আরোপ করে না যে পুরুরবার ঔরসে সন্তানের জন্মদান করে এক বছর পরে আবার স্বর্গে ফিরে আসতে পারবেন। এরপর মর্তে প্রত্যাবর্তন করে রাজমহিষীর অনুগ্রহে উবশী পুরুরবার সংস্কৃত সঙ্গে মিলিত হন। এবং উভয়ে সুখে দিনাতিপাত করতে লাগলেন। একদিন পুরুরবা উর্বশীসহ যখনা কৈলাস শিখরে গন্ধমাদন পর্বতে বিহার করছিলেন।

তখন উর্বশী নিজের অজ্ঞাতে নারী প্রবেশ নিষিদ্ধ বনে প্রবেশ করলেন সে লতায় পরিণত হয়। উবশী বিরহে রাজা তখন চেতন-অবচেতন জ্ঞানশূন্য হয়ে বনের বৃক্ষ-লতা-পশু-পাখি প্রত্যেককে প্রিয়তমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন আর এ সময়ে রাজা একদিন দৈব বাণীর সহায়তায় 'সঙ্গমনীয়মণি'র কথা জানতে পারেন। এই মণিটি নিয়ে রাজা একদিন একটি লতাকে আলিঙ্গন করলে লতাটি উর্বশীর রূপা ধারণ করে। ফলে প্রেমিক-প্রেমিকা বিহ যন্ত্রণার অবসান হয় এবং উভয়ে পুনর্বার মিলে সুখে দিনাতিপাত করেন।

এরপর নাটকের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ উর্বশীর জীবনে পূর্ণতা পায় পুত্র আয়ূর জন্মের মাধ্যমে। পুরুরবা পুত্রের সুখদর্শন করেন। পিতা-পুত্রের সুখদর্শনের পরে শর্তমতে উর্বশীকে স্বর্গে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে হয়। কিন্তু হঠাৎই নারদ এসে জানালেন যে, দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধে পুরুরবা সাহায্যের কথা স্মরণ করে ইন্দ্র উর্বশীকে পুরুরবার সঘেদ মর্তধামে অনুমতি দিয়েছেন। অবশেষে দেবতাদের সাহয্যের পুরস্কার স্বরূপ পুরুরবা উর্বশীর সঙ্গে আজীবন সুখে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেন।

উর্বশী বিরহে প্রেমোন্মত্ত পুরুরবার মর্মস্পর্শ বিলাপের যে কাব্যরূপ মহাকবি কালিদাস তাঁর সহৃদয় পাঠকদের উপহার দিয়েছেন তা বিশ্ব-সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ।

কালিদাসের অভিনবত্ব

মহাকবি কালিদাস কাহিনীসূত্র বেদ-মহাভারত-পুরাণ (পূর্ব উল্লেখ্য) থেকে গ্রহণ করলেও কাহিনীর বিয়গান্তক পরিণতি ত্যাগ করেছেন। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রীয় নির্দেশ মান্য করে কালিদাস এ নাটকটিকে মিলনাত্মক নাটকে পরিণত করেছেন। শেষ অংশে আয়ুর প্রবেশ এ নাটকের গতিপথ পাল্টে দেয়। উবশীর প্রতি ইন্দ্রের অনুগ্রহ, সঙ্গমনীয়মণী, উর্বশীর লতায় পরিণত হওয়া, বাজার উন্মত্তবৎ করুণ গান গাওয়া ইত্যাদি সম্পূর্ণ নাট্যকার কালিদাসের নিজস্ব কল্পনা। এসব কল্পনা কাহিনীকে গতিদান করেছে।

এ নাটকের চতুর্থ অঙ্কটি কালিদাসের অপূর্ব সৃষ্টি। যদিও এই চতুর্থ অঙ্কের নাটকীয়তা সেরূপভাবে উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু তা হলেও প্রকৃতি চিত্র অঙ্কন ও সঙ্গীত আরোপে নাট্যকার। কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

এ নাটকটি সেকালের বিচারে একমাত্র গীতিনাট্য। এখানে অপভ্রংশ ভাষায় অনেক গান। পাওয়া যায়; যার ভাষাতাত্বিক গুরুত্ব অপরিসীম। এগুলি সেকালের কথ্যভাষার গানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খাটি নিদর্শন। নাটকের সংলাপে সংস্কৃতের পরিবর্তে মহারাস্ত্রী প্রাকৃত। ও অপভ্রংশ শব্দের বহুল

ব্যবহার হয়েছে। শোকোন্মত্ত রাজা ইতর প্রাণীদের সঙ্গে। বলতে সাধু সংস্কৃত ব্যতিরেকে সাধু ও লৌকিক মিশ্রভাষার ব্যবহার করেছেন। এ মিশ্র ভাষার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে রাজা যেন অভিজাত্যের বেড়া ভেঙে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি এসেছেন।

চরিত্র-চিত্রণ

এ নাটকের মূল চরিত্র উর্বশী। উর্বশীকে কবি প্রেমের সাধিকা করে গড়ে তোলার পাশাপাশি কামোদ্দীপ্তা এবং ক্রীড়াময়ী করে তুলেছেন। প্রিয়তমাকে পাওয়ার উৎকণ্ঠায় আনন্দে কামনায় তিনি হয়ে উঠেছেন মাটির কাছাকাছি মানুষ। তাঁর জীবনটাই নাট্যময়। বিপদে পড়া-বিপদ থেকে রক্ষা তারপর প্রেম-প্রেমপর্বেই প্রিয়তমর নাম নেওয়ায় অভিশপ্ত তথা বিরহময় জীবন পালন এবং দৈবগত ভাবে রাজা পুরুরবার সঙ্গে পুনর্মিলন তারপর আবার বিচ্ছেদ; সন্তান লাভ এবং বিচ্ছেদের আশঙ্কা; কিন্তু অবশেষে মিলনান্তকের মধ্য দিয়ে তাঁর নাট্যময় জীবনের পূর্ণতা লাভ।

পুরুরবাও এ নাটকের প্রধান পুরুষ চরিত্র তথা নায়ক চরিত্র। তাঁর বীরত্বের কথাই এ নাটকে বারবার উল্লেখিত হয়েছে। পুরুরবা মূলত প্রেমিক পুরুষ; যার মধ্যে আছে তীব্র কামুকতা, আর এই তীব্র কামুকতার পরিচয় আমরা পাই চতুর্থ অঙ্কে। এ অংশেই রাজার আচার-আচরণ সংলাপ সমস্ত কিছুর মধ্যে অতিনাটকীয়তা বর্তমান। কিন্তু তা হলেও ভাব প্রবণ রাজার প্রেমিক মনটি নাটকটিকে কাব্যোৎকর্ম দান করেছেন।

উর্বশী ও পুরুরবার পাশাপাশি পার্শ্বচরিত্র ইন্দ্র, পুত্র আয়ুর, নারদ, উর্বশীর সখি চিত্রলেখা প্রমুখ চরিত্রগুলির নাটকটিকে গতিদান করেছে। এ নাটকে বিদূষক চরিত্রটি গৌণ হলেও জীবন্ত, কেননা তাঁর বোকামি ভাঁড়ামি নাটকে রিলিফ এনেছে। চরিত্রের দিক থেকে এটি টাইপ জাতীয় চরিত্র।

মূল্যায়ন

পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত এ নাটকে কালিদাস সাধারণ মানব-মানবীর প্রেম ভালোবাসাকেই চিত্রণ করেছেন। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নাটকটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বেশ জনাটে। মিলনান্তক বিয়গাওঁক এবং মিলনান্তক এই চড়াই উতরাই-এর মধ্য দিয়ে বিক্রমোর্বশীয়ম নাটকটি গড়ে উঠেছে। উর্বশীর কৈলাস যাত্রা, শিবার্চনা, ফেরার পথে দৈত্য কর্তৃক অপহৃত হবার মুহূর্ত, নাটকীয়ভাবে পুরুরবা কর্তৃক উবার এবং এর পরেই তাঁদের প্রেমপর্ব নিয়েই নাটকটি সম্পূর্ণতা পেয়েছে। রাজা পুরুরবা নাট্যকার কালিদাসের কলমে বীর, প্রেমিক ও পুত্রবৎসল পিতারূপে চিত্রিত হয়েছে। সাধারণ রাজার মত ব্যাভিচারী নন, ইনি পত্নী প্রেমনিষ্ঠ, সাহসী এবং সর্বোপরি মানবিক গুণসম্পন্ন। কোন কোন সমালোচক পুরুরবা প্রেমাবেগ জনিত ব্যাকুলতাকে বারাবারি বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে রাজার প্রেম ব্যাকুলতা রাজার চরিত্রের দূর্বলতার দিক। কিন্তু আমরা মনে করি একথা ঠিক নয়। কেননা মহাকবি কালিদাস পুরুরবাকে শুধুমাত্র রাজার পরিচয়ে আবৃত রাখতে চান নি। তিনি রাজা পুরুরবার চরিত্রের মধ্য দিয়ে একজন আদর্শ প্রেমিকরূপে গড়ে তুলেছেন। প্রেমিকপুরুষ আবেগপ্রবণ হয়। রাজা পুরুরবা রাজা হলেও তাঁর সত্ত্বা প্রেমিক সত্ত্বা। এ সত্ত্বাকে কালিদাস অস্বীকার করেন নি, করতেও

চাননি। একথা ঠিক চতুর্থ অঙ্কে উবশীর লতায় পরিণত হওয়ার এবং রাজার সঙ্গমনীয়মনি লাভ এ সবই অতিনাটকীয়তা দোষে দুষ্ট। আসলে নাট্যকার নাটকে এই সংস্কৃত সাহিত্যের আতিনাটকীয়তা অবতারণা করে সেকালের দৈব প্রাপ্ত ঘটনাক্রমের কথাই আমাদের জানিয়েছেন। কিন্তু তা হলেও এই চতুর্থ অঙ্কে কালিদাস যে প্রকৃতিবত্তার পরিচয় দিয়েছেন। তা অনবদ্য। 'মেঘদূত' কাব্যে আমরা যেমন মহাকবির প্রকৃতিবত্তার পরিচয় পাই এখানেও আমরা সেই একই ঘটনাক্রমকে লক্ষ্য করি ভিন্নরূপে। চতুর্থ স্বর্গ সম্পর্কে অধ্যাপক সুশীলকুমার দে বলেছেন, ''The fourth act on the madness of Pururabas is unique in this sense. The scene is hardly dramatic and has action– but it reaches an almost lyric height ib depicting the tunultous ardour of undisciplined passion."

চতুর্থ অঙ্কে গীতিময়তার পরেই পঞ্চম অঙ্কে নাটকীয় ঘটনায় মিলনান্তকের মধ্য দিয়ে নাটক শেষ হয়েছে। মহাকবি স্বর্গের অপ্সরাকে মর্ত্যের মানুষের কাছে নামিয়ে এনে মানুষের মহিমাকেই প্রচার করেছেন। বিরহ তপস্যা অগ্নিতে পুড়েই যে প্রেম খাঁটি সোনা হয়। সে কথাই নাট্যকার এ নাটকে উর্বশী ও পুরুরবার মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। এখানে যেন আমরা শকুন্তলার পূর্বছায়া লক্ষ্য করি। সেইসঙ্গে 'পুত্র-লাভেই পরিণয়ে পূর্ণতা'; এই তত্ত্ব এ নাটকে আমরা খুঁজে পাই। উপমা কালিদাসস্য; এই প্রবাদপ্রতিম বাক্যের প্রতিফলন এ কাব্যে উর্বশী চরিত্রেও মূর্ত হয়। ফলকথা, বিষয় ও ভাবের বন্ধনে এ নাটকটি সংস্কৃত সাহিত্যের এক ঐশ্বর্যময় সাহিত্য সম্পদ হয়ে আছে এবং থাকবে।

২৯.৫ গ) অভিজ্ঞান শকুন্তলম

অভিজ্ঞান শকুন্তলম : উৎস

মহাকবি কালিদাসের রচিত বিশ্ববিশ্রুত নাটক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' সব থেকে পরিণত এবং শ্রেষ্ঠ নাটক। রসবেত্তারা বলেন 'কালিদাসস্য সবর্ম অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে তিনি যে নাটক রচনা করেছিলেন তার রসমূলা সৌন্দর্য ভাবতত্ত্ব নাট্য গুরুত্ব ভারত তথা বিশ্বনাট্য ইতিহাসে আজও শ্রেষ্ঠত্ব শিরপা পেয়ে আসছে। পরিণাম দিয়ে যে সাহিত্যের মাপকাটি নির্ণিত হয় না, হয় তার বিষয় রসগত দিকে থেকে একথা মহাকবি কালিদাস যথার্থ ভাবে প্রমাণ করেছেন অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের মাধ্যমে।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের বর্ণিত দৃষ্যন্ত শকুন্তলা উপাখ্যানটি অত্যন্ত প্রাচীন, শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে বৌদ্ধ জাতক পর্যন্ত অনেক গ্রন্থেই এ কাহিনী লিপিবদ্ধ। উল্লেখ্য জাতকে দ্যুন্তের পরিবর্তে রাজা ব্রহ্মদত্তের নামে উল্লেখিত। মহাভারত, ভাগবত, হরিবংশ, গরুড়পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ পদ্মপুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থেও এ আখ্যান রয়েছে বিষ্ণুপুরাণে দুর্বাশার অভিশাপের কথা উল্লেখ থাকলেও অঙ্গুরীয়'র উল্লেখ নেই। পদ্মপুরাণে বর্ণিত দুষান্ত-শকুন্তলার আখ্যানের সঙ্গে কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের সাদৃশ্য থাকলেও এই পুরাণকে উৎসরূপে বিবেচনা করা যায় না, কেননা বিশেষজ্ঞদের মতে পদ্মপুরাণ পরবর্তীকালে রচনা।

পদ্মপুরাণে বর্ণিত দুষ্যন্ত শকুন্তলা আখ্যানের সঙ্গে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের কাহিনীর অনেক

যে সাদৃশ্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না। তবে বৈসাদৃশ্যও আছে। যেমন, পুরাণে শকুন্তলার সঙ্গে প্রিয়ংবদা হস্তিনাপুরের রাজসভায় গমন করেছেন, স্নানের আগে শকুন্তলা প্রিয়ংবদার হাতে অঙ্গুরীয় দিলে তা প্রিয়ংবদার হাত থেকে সরস্বতী নদীতে পড়ে যায়। কিন্তু প্রিয়ংবদা ভয়ে তা বলেন না এবং শকুন্তলাভ ব্যাপারটি উদাসীন থেকে যায়। আবার এর অমিলও পুরাণে লক্ষ্য করা যায়। রাজা দুষ্যন্ত সর্বদমনকে দেকে যখন অপত্য স্নেহ।

নাট্যকাহিনী

মহাকবি কালিদাস রচিত অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকটি সাত অঙ্কে সম্পূর্ণ। সাত অঙ্কের কাহিনী অংশ অঙ্কভিত্তিক উল্লেখ করছি :

প্রথম অঙ্ক

'যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা' শ্লোকে অষ্টমূর্তিবর ঈশকে প্রণাম জানিয়ে প্রথম অঙ্কের সূচনা। এরপর প্রস্তাবনায় নটী ও সূত্রধারের মধ্যে পারস্পরিক সংলাপের মাধ্যমে নাটকের নাম, নাট্যকারের নাম, বিষয় বস্তুর ঈঙ্গিত ইত্যাদি ইত্যাদি। অতঃপর ধনুর্বাণ হাতে রথে আরোহণ করে এক মৃগকে অনুসরণ করতে করতে নাটকের নায়ক রাজা দুষ্যন্তের আগমন। মালিনী তীরবর্তী কন্বাশ্রমের বৈখানসেরা রাজা দুষ্মন্তকে আশ্রম মৃগের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করতে নিষেধ করলে রাজা তৎক্ষণাৎ সে কাজে বিরত হন, এরপর তাঁরা রাজাকে রাজচক্রবর্তী পুত্রলাভের আশীর্বাদ করে আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণের অনুরোধ জানালে, রাজা বিনীতভাবে আশ্রমে প্রবেশ করতে উদ্যোগী হলেন কিন্তু সে সময় তাঁর দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হলে শান্তরস প্রধান ঋষির আশ্রমে বরস্ত্রীলাভের সম্ভাবনা কোথায়; সে বিষয়ে চিন্তা করতে করতে আশ্রমে প্রবেশ করেন। সে সময়ে তিনি দক্ষিণ দিকের বটবৃক্ষের আলবালে জল সেচনরতা তিনজন অপরূপা আশ্রম কন্যা দেখে তাদের রূপলাবণ্য উপভোগ করার জন্য বৃক্ষের অন্তরালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে অবস্থান করেন। এমন সময় এক ভ্রমর শকুন্তলাকে বার বার আক্রমণ করতে লাগল, শকুন্তলা তাকে বাধা দিয়েও নিরস্ত করতে না পেরে সাহায্য প্রার্থনা করলে রাজা দুষ্যন্ত পরিত্রার ভূমিকা অবতীর্ণ হন এবং নিজেকে পুরুবংশের রাজ প্রতিনিধি বলে পরিচিতি দেন।

প্রথম দর্শনের দুষ্যন্ত শকুন্তলা একে অপরের প্রতি পূর্বরাগাক্রান্ত হলেন। এরপর শকুন্তলার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য অর্থাৎ তাঁর জন্মবৃত্তান্ত, ক্ষত্রিয় পরিণয় যোগ্যা কিনা, ইত্যাদি জেনে নিলেন। এবং আশ্বস্ত হলেন এই ভেবে যে শকুন্তলাকে পত্নীরূপে পেতে তার আর কোন অসুবিধা নেই বলে। শকুন্তলা দুষ্মন্তের আলাপচারিতার সময় হঠাৎ আশ্রমে এক কোলাহল সৃষ্টি হয়। রাজা দুষ্মন্তের সৈন্য সমাপ্ত দেখে ভয় পেয়ে কোন এক বন্যগজ আশ্রমে প্রবেশ করে সব কিছু বিপর্যস্ত করে দেয়। অতঃপর তপস্বিদের সতর্কবার্তা শুনে রাজা বিদায় নিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলে, শকুন্তলা তাঁর বস্ত্রাঞ্চল কুরবকশাখায় বিধেঝে ছল করে রাজাকে দেখতে থাকলেন। রাজা শকুন্তলার রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হয়ে রাজ্যে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে আশ্রমের অদূরেই এক শিবিরে গমন করলেন, এবং যেতে যেতে বললেন; 'গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদ সংস্থিতং চেতঃ চীনাংশুকমির কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য।'

অর্থাৎ বাতাসের প্রতিকূলে নীয়মান পতাকার দন্ড যেমন আগে চলে এবং পতাকা যুক্ত চীনাপট্টবস্ত্র বাতাসের বিপরীত দিকে চলে, সেরূপ রাজার দেহও চলছে আগে আগে; কিন্তু তাঁর মন চঞ্চল হয়ে চলছে তার বিপরীতে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম অঙ্কের প্রবাহ দ্বিতীয়াঙ্ক। রাজা দুষ্যন্তের হৃদয়াচিত্রই এ অংশে অধিকতর পরিস্ফুট। আশ্রমে শকুন্তলাকে দেখার পর থেকেই দুষ্যন্তের চিত্ত ব্যাকুল, নিদ্রাহীনভাবে রাত্রি যাপন করতে থাকেন। কিভাবে আশ্রমে পুনরায় প্রবেশ করা যায় তা নিয়ে রাজা চিন্তা ভাবনা করতে লাগলেন। এ সময়ই আশ্রম থেকে দুজন তাপস এসে রাজাকে আশ্রমে রাক্ষসদের সংস্কৃত উপদ্রবের কথা জানান এবং তাকে কয়েকদিনের জন্য আশ্রমে অবস্থান করতে অনুরোধ করলেন। রাজা ঋষিদের প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য আশ্রমে যেতে প্রস্তুত হলেন কিন্তু সে সময় রাজধানী থেকে 'করভক' নামে এক দ্রুত এসে রাজাকে জানান যে রাজমাতা 'পুত্রপিত্ত পালন ব্রত' রাজা রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হতে বলেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই রাজা দ্বিধাগ্রস্থ। হলেন কি করবেন এই ভেবে। শেষপর্যন্ত বিদূষককে নিজের প্রতিনিধিরূপে রাজধানীতে প্রেরণ করলেন এবং নিজে রাক্ষস দমনে আশ্রমে প্রবেশ করলেন। অবশ্য যাবার পূর্বে তিনি বিদূষককে। বলে গেলেন—''বন্ধু, শকুন্তলার বিষয়ে তোমাকে যা বলেছি সবই ''পরিহাস বিজলিপ্তম্''-এর মধ্যে কোন সত্যতা নেই। তাই তুমি এতে গুরুত্ব আরোপ করো না। আসলে, শকুন্তল বৃত্তান্ত রাজ অন্তঃপুরের সকলে জেনে গেলে পরবর্তী সময়ে রাজার পক্ষে শকুন্তলা প্রত্যাখ্যান অসম্ভব হয়ে পড়বে।

তৃতীয় অঙ্ক

রাজা দুষ্যন্তের উপস্থিতিতে কন্বাশ্রমে রাক্ষসদের উপদ্রবের শেষ হয়। এ দিকে শকুন্তলা সম্ভোগ কামনায় পীড়িতা। অনুসূয়া এবং প্রিয়ংবদা উশীরলেপন ও সনাল নলীনিপাত্র নিয়ে শকুন্তলার পরিচর্যায় ব্যস্ত। রাজা দুষ্যন্তও শকুন্তলার সন্ধানে বেড়িয়ে মালিনী তীরে বেতসকুঞ্জ তাকে আবিষ্কার করেন কিন্তু নিজেকে গোপন রেখে সখীদের মুখে শকুন্তলার অন্তরের কথা শুনলেন, সখীরা শকুন্তলাকে পদ্মপত্রে নখের আঁচড়ে প্রণয়লিপি রচনা করে রাজার কাছে তা প্রেরণ করার পরামর্শ দিলে, শকুন্তলা তা রচনাও করে সখীদের পত্র বিষয় পাঠ করে শুনাতে শুরু করলে রাজা দুষ্যন্ত তাদের সমক্ষে হাজির হন। সখীরা শকুন্তলা এবং দুষ্যন্তের একান্ত পারস্পরিক নিবিড় আলাপের অবকাশ করে দেন। কিন্তু শকুন্তলার দেহতাপ নিবারণের জন্য শান্তিবারি হাতে গৌতমী সেখানে উপস্থিত হলে রাজা অন্তরালে চলে যান। এবং শকুন্তলাকে নিয়ে গৌতমী আশ্রমের পর্ণকুটিরে চলে গেলেন। রাজা দুয্যন্তও রাক্ষস দমনে আত্মনিয়োগ করলেন।

চতুর্থ অঙ্ক

এ অংশে শকুন্তলার সখীদ্বয় পুষ্প চয়ন করতে করতে সম্প্রতি গান্ধর্ব বিধিমতে পরিণীতা শকুন্তলাকে

রাজা রাজধানীতে গিয়ে মনে করবেন, কিনা এ বিষয়ে আলোচনা কালীন ঋষি দুর্বাসা আশ্রমে আবির্ভূত হলেন। কিন্তু দুষ্যন্ত চিন্তায় মগ্ন থাকার জন্য শকুন্তলা তাঁর উপস্থিতি বুঝতে পারেন নি। ফলে আতিথেয়তায় যত্নশীলা হন না। শকুন্তলার এ রূপ আচরণে ঋষি ক্রুব হন এবং শকুন্তলাকে অভিশাপ দেন এই বলে যে, শকুন্তলা যার কথা চিন্তা করছেন, মনে করিয়ে দিলে ঐ ব্যাক্তি তাকে চিনতে পারবেন না। অবশেষে সখীদের প্রচেষ্টায় শাপমুক্তির উপায় জানা গেল যে, শকুন্তলা ঐ ব্যক্তির দেওয়া কোনো অভিজ্ঞান দেখাতে পারলে সে ব্যক্তি তাকে চিনতে পারবে।

এদিকে মহর্ষি কন্ব সোমতীর্থ থেকে ফিরে এসে আশ্রমে প্রবেশকালে দৈববাণীর মাধ্যমে জানতে পারলেন শকুন্তলা রাজা দুষ্যন্তের সঙ্গে গান্ধর্বমতে পরিণয় সূত্রে আবন্ধ হয়েছেন। এবং এটাও জানতে পারলেন যে শকুন্তলা সন্তান-সম্ভবা। উদারচেতা মহর্ষি কল্প দুযাও শকুন্তলার এই বিবাহ অনুমোদন করে শকুন্তলাকে পতীগৃহে পাঠানোর জন্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার নির্দেশ দিলেন। শকুন্তলার বিদায় আসন্ন জেনে তাঁর সখীদ্বয় অনুসূয়া-প্রিয়ংবদা এমনকি আশ্রমের পশুপাখি সকলেই বিহ্বল হয়ে পড়লেন। শকুন্তলা সকলকে শোকে নিমগ্ন করে আশ্রম ত্যাগ করে হস্তিনাপুরের যাত্রা করলেন।

পঞ্চম অঙ্ক

সংগীতশালা থেকে রাজার পূর্বপ্রণয়িণী হংসপদিকার গীতশ্রবণ করে রাজা বিদূষককে প্রেরণ করলেন নাগরিক বৃত্তিতে তাঁকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে। এ সময়েই মহর্ষি কণ্ঠের আশ্রমে ঋষিদের সঙ্গে দুজন নারী প্রবেশ করেন। তাঁরা রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে, রাজা দুষ্যন্ত তাঁদের আগমনের কারণ জানতে চাইলেন। ঋষিগণ উত্তরে জানালেন যে, মহর্ষি শকুন্তলা ও রাজা দুষ্যন্তের গান্ধর্ব বিবাহ অনুমোদন করেছেন, এই সঙ্গে তাঁরা মহর্ষির বাসনার কথা জানালেন—রাজা যেন সন্তান-সম্ভবা ধর্মপত্নী শকুন্তলাকে যথোচিত মর্যাদাসহ অন্তঃপুরে স্থান দেন। কিন্তু দুর্বাসার অভিশাপে রাজার মন মোহাচ্ছন্ন থাকায় শকুন্তলার স* তাঁর প্রণয় পর্ব এবং বিবাহের কথা স্মরণ করতে পারলেন না। ফলে, শকুন্তলাকে তাঁর পূর্বপরিণীতা পত্নীরূপে স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করলেন। শকুন্তলা তাঁর পূর্বপরিণয়কে প্রমাণ স্বরূপ রাজার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়টি দেখাতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে তার অঙ্গুলিতে রাজার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়টি নেই। ফলে শকুন্তলাকে ভর্ৎসনা করে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু রাজপুরোহিতের বিবেচনায় স্থির হল সন্তান-সম্ভবা শকুন্তলা সন্তানের জন্ম দেওয়া পর্যন্ত রাজপুরোহিতের গৃহেই থাকবেন এবং পুত্র সন্তান যদি রাজচক্রবর্তী লক্ষণ যুক্ত হয়, রাজা তাহলে শকুন্তলাকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করবেন। আর না করলে শকুন্তলাকে তাঁরা কণ্ঠের আশ্রমে প্রেরণ করবেন।

ষষ্ঠ অঙ্ক

এক ধীবর রাজার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়টি পেয়ে বাজারে বিক্রি করতে এলে রাক্ষপুরুষদের হাতে ধরা পড়লেন। রাক্ষপুরুষেরা তাকে বন্দী করে বিচারের জন্য রাজার কাছে নিয়ে যায়। এ সময় ধীবর তাদের জানালো যে, একটি বৃহৎ রোহতিমৎস্য তার জালে ধরা পড়লে, সে মাছটিকে বিক্রি করার জন্য মৎস্যটিকে কাটলে দেখে যে মৎস্যটির উদর অভ্যন্তরে এ অঙ্গুরীয়টি। অঙ্গুরীয়টি বাজারে বিক্রি করতে

আসলে রক্ষিপুরুষেরা তাকে চোর সন্দেহ বন্দি করে। কিন্তু আদতে সে চোর নয়। যা-হোক ধীবরের কাছ থেকে রাজা অঙ্গুরীয়টি পেয়ে তাকে যথাযত অর্থদান করেন। অঙ্গুরীয়টি অবলোকন করে রাজার পূর্বস্মৃতি স্মরণে আসে ফলে শকুন্তলাকে ভর্ৎসনা বিতাড়নের জন্য অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হতে থাকলেন। শকুন্তলার শোকে কাতর হতে রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলার আলেখ্য অংকন করে শান্তি পেতে সচেষ্ট হলেন। এদিকে শকুন্তলা বান্ধবী ভানুমতী রাজপ্রাসাদে এসে রাজার শোকাচ্ছন্ন রূপ দেখে শকুন্তলা জননী মেনকাকে সব জানালেন।

সপ্তম অঙ্ক

স্বর্গে কালনেমির বংশধর 'দুর্জয়' নামক দানব সঙ্ঘকে পরাস্ত করে ইন্দ্র সারথি মাতলির সঙ্গে রাজা দুষ্যন্ত রথারোহণে স্বর্গ থেকে অবতরণকালে পথে হেমকুট পর্বতে ভগবান মারীচের পবিত্র তপোবন দেখে সেখানে মারীচকে শ্রদ্ধা জানাতে প্রবেশ করলেন। রাজা সে সময় সিংহ শিশুর উৎপীড়নরত এক সুন্দর মানব শিশুকে দেখে অপত্যস্নেহের সঞ্চার অনুভব করেন। মানব শিুটি তাপসীর নিকট হতে খেলনা নেবার জন্য হাতটি প্রসারণ করলে, রাজা তার হস্তে রাজচক্রবর্তী লক্ষণ দেখতে পেলেন। পরে রাজা আরো জানতে পারলেন যে শিশুটি পুরুবংশজাত এবং শিশুটির পিতা তাঁর ধর্মপত্নীকে বিসর্জন করেছেন। মানব শিশুটির হস্ত থেকে সিংহ শিশুটি রক্ষা করার জন্য এক তাপসী একটি মৃত্তিকা ময়ূর এনে শিুটিকে বললেন– 'শকুন্তলাবণ্য প্রেক্ষব', 'শকুন্ত' অর্থাৎ পাখির সৌন্দর্য দেখ। শিশুটি যে সময় তাপসীর নিকট জানতে চাইলেন 'মা কোথায়?' শিশুটির এই প্রশ্নের জন্য রাজার ধারণা হল শকুন্তলা শিশুটির জননীর নাম এবং তিনিই শিশুটির পিতা। ইতিমধ্যে সর্বদমনের হাত থেকে বক্ষাবন্ধনটি মাটিতে স্থলতি হলে রাজা সেটি তুলে নিলেন। তাপসীরা জানালেন যে বালকের পিতা বা মাতা ব্যতীত তৃতীয় কোন ব্যক্তি তা স্পর্শ করলে কবচটি সর্পরূপ ধারণ করে দংশন করবে কিন্তু রাজার ক্ষেত্রে এরূপ ঘটনা ঘটলো না দেখে রাজা নিশ্চিন্ত হলেন যে তিনিই বালক সর্বদমনের পিতা। এমন সময় মলিন পোষাক পরিহিতা শকুন্তলা সেখানে উপস্থিত হলে রাজা তাঁর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করেন নিজের কৃতকর্মের জন্য। অতঃপর সপুত্র শকুন্তলাকে নিয়ে হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করলেন। এখানেই নাটকের পরিসমাপ্তি।

চরিত্ররূপ

শকুন্তলা নাটকের চরিত্র সৃষ্টিতেও মহাকবি কালিদাস কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন। ঋষি কণ্ঠ, রাজা দুষ্যন্ত, শকুন্তলা, সখী অনসূয়া প্রিয়ংবদা, বিদূষক, শাঙ্গরব ও শরদ্বত এ সকল চরিত্র কালিদাসের নাট্য প্রতিভাতে ভাস্বর।

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের নায়ক দুষ্যন্তের স্থান অনন্য ও অতুলনীয়। তিনি ধীরদাও ক্ষত্রিক নায়ক। 'পুরুবংশীয়' বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। ন্যায় ও নৈপুণ্যের অধিকার, স্বভাবে বিনয়ী। শকুন্তলার অসামান্য রূপলাবণ্যে তিনি মুগ্ধ হলেও কোনরূপ প্রলোভনকে প্রশ্রয় দেন। নি। সর্বোপরি তিনি পরিশীলিত বাচনভঙ্গী, মার্জিতরুচি এবং আভিজাত্যের পরিচয়বাহী। রাজা দুষ্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ আদর্শ

নরপতি, তাঁর কাছে সুবিশাল রাজ্য ও আশ্রবালা শকুন্তলা উভয় সমান মূল্য।

নায়িকা শকুন্তলা মহাকবি কালিদাসের 'মানস প্রতিমা'। আদর্শ রমণীর সকল বৈশিষ্ট্যই তাঁর চরিত্রে বিদ্যমান। আজন্ম আশ্রমে লালিত সারল্য এবং সহজমনা বিশ্রামে পরিশীলিত। অনুসুয়া ও প্রিয়ংবদার সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে তিনি আবব। রাজা দুষ্যন্তের আগমনে তাঁর প্রেম ব্যাকুল হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ সাধারণ প্রেমিকা স্বরূপভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। আশ্রমের তরুলতা পশুপক্ষী ইত্যাদির সঙ্গে তাঁর নিবিড় প্রীতি সম্পর্ক। রাজা দুষ্যন্তের প্রোষিতভর্তৃকার মতই তাঁর বিরহ ব্যাকুল হৃদয় অবশেষে পুত্র সর্বদমনের মাধ্যমে দীর্ঘ বিরহ যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি নূতনভাবে জীবন পর্ব শুরু করেন।

মহর্ষি কন্ব ঋষি হয়েও গৃহি, মানবোচিত। সংসার বিরাগী ঋষি হয়েও তিনি অনুকম্পা ও করুণাবশতঃ শিশু শকুন্তলাকে যত্ন সহকারে লালনপালন করেছেন। কঠোর বৈরাগ্য ও কঠিন সংযম তাঁহার হৃদয়ের স্নেহ মমতা প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিগুলোকে ভুলে যান নি। শকুন্তলার আসন্ন বিচ্ছন্নে তিনি বিহ্বল কাতর হয়ে পড়েছেন।

অনুসূয়া এবং প্রিয়ংবদা শকুন্তলার প্রিয়সখী। শকুন্তলার মঙ্গল কামনায় দুই সখীই সমান আগ্রহী। শকুন্তলার সুখ, দুঃখে তাঁরা সর্বদা সাথী। বিদূষক এক হাসোদ্দীপক সহৃদয় ব্যক্তিরূপে অনন্য একক সমালোচকের ভাষায়, "The Vidusaka in the Avhijnanasakuntalam is more than a Veritable Jester."

মূল্যায়ন

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-ই নাট্যকার কালিদাসের স্বীকৃতির একমাত্র নাটক। মূলত এই নাটকটির জন্যই তিনি বিশ্ববাসীর কাঝে পরিচিত। বিশ্বের বহু ভাষায় এ নাটকটি রচিত হয়েছে। ফলে দেশি-বিদেশি সকল সমালোচক ও পন্ডিতদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাধন্য হয়েছেন। টীকাকার। মল্লিনাথ, পাশ্চাত্যমনীষী গোটে, শিলার এমনকি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'শকুন্তলা' নাটক সম্পর্কে বলেছেন :

> ''প্রথম অঙ্কবর্তী সেই মর্ত্যের চঞ্চল সৌন্দর্যময় বিচিত্র পূর্ব মিলন হইতে স্বর্গে তপোবনে শাশ্বত, আনন্দময় উত্তর মিলনে যাত্রাই অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক।"

তিনি আরো বলেছেন:

> ''শকুন্তলার মধ্যে একটি গভীর পরিণতির ভাব আছে, সে পরিণতি ফুল হইতে ফুলে পরিণতি, মর্ত্য হইতে স্বর্গে পরিণতি, স্বভাব হইতে ধর্মে পরিণতি।"

অর্থাৎ ধর্ম ও স্বভাবের বিরোধে শেষ পর্যন্ত ধর্মের জয়কেই নাট্যকার জয়ী করেছেন। শকুন্তলা এমনই এক নাটক যেখানে তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, এবং স্বর্গ-মর্ত্যাকে এ সঙ্গে অবলোকন করা যায়।

নাটকের প্রথম অঙ্কে যৌবনে বাধা-বন্ধন শূন্য আবেগ-আসক্তি সামাজিক বাধা নিষেধকে অগ্রাহ্য করে প্রেমাবেগের জয় ঘোষিত হয়েছে। শকুন্তলা ও রাজা দুষ্যন্তের মিলন পর্ব রচিত হয়েছে। প্রেম পূর্বরাগ অভিসার বিরহ এসবই এ পর্বে একে একে ঘটেছে।

দ্বিতীয় অঙ্কে রাজা দুষ্যন্তের বিরহ ব্যকুল হৃদয় চিত্তের কথার পাশাপাশি লোক নিন্দার ভয়ে বন্ধ

বিদূষকে শকুন্তলা প্রসঙ্গ ‘পরিহাস বি জল্পিতম’ বলে সত্যের অপলাপ করেছেন।

তৃতীয় অঙ্কে রাজা দুষ্যন্তের রাক্ষস দমনে ব্রতী হয়েছেন। এর পাশাপাশি শকুন্তলার সম্ভোগ কামনার উত্তাল চিত্রণ এবং রাজা দুষ্যন্তের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ কিন্তু মিলন পর্ব ব্যতিরেকে উভয়ে বিচ্ছেদ বেদনায় আক্ষেপানুসারে পূর্ণ হয়েছে এ পর্ব।

চতুর্থ অঙ্ক নাটকের সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় এই অংশে প্রকৃতির সজীবতা এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের যে অচ্ছেদ্য বন্ধন, সেই সঙ্গে গার্হস্থ্য জীবনবোধ ও পরিমিতিবোধ মহাকবি কালিদাস তার নাট্য ও কবিত্ব দিয়ে চিত্রিত করেছেন।

এই অঙ্কে দুষ্যন্তের চিন্তায় মগ্ন শকুন্তলা অভিশাপাত্তন হল ঋষি দুর্বাসা কর্তৃক। শকুন্তলা ও দুষ্যন্তের মধ্যে মিলনের বিষয় হয়ে ওঠে অভিজ্ঞান– অঙ্গুরীয়। শকুন্তলার পতীগৃহে যাত্রাকালে সখীদ্বয় অনুসূয়া-প্রিয়ংবদা, আশ্রমের পশুপাখি সকলেই বিষণ্ণ ব্যথাতুরা কন্ব স্বয়ং যেন ভারতীয় পিতার প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে। মানুষ ও প্রকৃতির এই অন্তরঙ্গ চিত্রণ কালিদাসের অনন্যতার স্বাক্ষর।

তবে এ অঙ্কে কবিত্ব যতটা বড় ভূমিকা পালন করেছে, নাটকীয়তা ততটা নয়। চতুর্থ অঙ্ক অপেক্ষা পঞ্চম অঙ্ক নাটকীয়তায় পূর্ণ। এ অংশে উৎকণ্ঠা, শকুন্তলা প্রত্যাখানের পাশাপাশি রাজপুরোহিতদের সিবান্ত এ দৃশ্যে নাট্যকার সত্য প্রতিষ্ঠার নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বে হাজির করেছেন।

ষষ্ঠ অঙ্কে অপ্রত্যাশিত চমক নাট্যকাহিনীকে গতি সঞ্চার করেছে। ধীবর কর্তৃক অঙ্গুরীর লাভ, অবশেষে অঙ্গুরীয় অবলোকন করে রাজা দুষ্যন্তের পূর্বস্মৃতি স্মরণ এবং শকুন্তলাকে ভর্ৎসনা প্রত্যাখ্যানের অনুশোচনা ও ফিরে পাওয়ার জন্য ব্যকুলতা প্রকাশ পেয়েছে।

শেষ অঙ্কে কালিদাস অনিন্দ্যসুন্দর সর্বদমন ভরতের সঙ্গে দুষ্যন্তের পরিচয় এবং নাটকীয়ভাবে শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্যন্তের মিলন এ সবই সুন্দরভাবে চিত্রিত। এ দৃশ্যে ঘটনা পরম্পরা এবং বাক্‌বিন্যাসের পরিমিতি বোধ পরিণত নাট্যকার কালিদাসেরই স্বীকৃতি।

২৯.৬ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ক) কালিদাস কোন গুপ্ত সম্রাটের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন?

খ) কালিদাসের পূর্বকালের দু’জন কবির নাম লিখুন।

গ) ‘মালবিকাগ্নিমিত্র’ নাটকের অঙ্ক সংখ্যা কয়টি?

ঘ) ‘মালবিকাগ্নিমিত্র’ নাটকের নায়ক অগ্নিমিত্র কোন বংশের রাজা ছিলেন?

ঙ) মালবিকা কোন রাজ্যের বাসিন্দা ছিলেন?

চ) ‘মালবিকাগ্নিমিত্র’ নাটকটি কোথায় প্রথম অভিনিত হয়?

ছ) ‘বিক্রমোধশী’ নাকটির অঙ্ক সংখ্যা কয়টি?

জ) ‘বিক্রমোধশী’ নাটকটি কোন পুরান কাহিনী নির্ভর?

ঝ) ঊর্বশীকে কোন মুনি অভিশাপ দিয়ে স্বর্গভ্রষ্ট করেন?

ঞ) ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম’ নাটকের অঙ্ক সংখ্যা কয়টি?

২। ক) কালিদাসের নাটকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

২৯.৭ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। কালিদাসের গ্রন্থাবলী (সমগ্র)–বসুমতী (১০ ম সং-১৩৬০)

২। কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ (১ম, সং-১৯৬৫)–বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য।

৩। সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস–ড. দেবেশ কুমার আচার্য।

৪। সংস্কৃত সাহিত্যের নির্বাচিত পাঠ–প্রদ্যোত বিশ্বাস

৫। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস–শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

২৯.৮ উত্তর সংকেত

১। ক) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য।

খ) ব্যাস, বাল্মিকী।

গ) পাঁচটি।

ঘ) সুঙ্গ বংশের।

ঙ) বিদর্ভ রাজ্যের সামন্ত মাধব সেনের ভগ্নী ছিলেন।

চ) উজ্জয়িনীতে প্রথম অভিনীত হয়।

ছ) পাঁচটি।

জ) বেদের ঋগ্‌বেদ থেকে কাহিনী গ্রহণ করা হয়েছে।

ঝ) ভরতমুনি।

ঞ) সাত অঙ্ক বিশিষ্ট।

২। ক) ২৯.৫ অংশ দেখুন।